কৃমির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ... ৪
জীবাণু–কিছু কথা ... ৫
ডায়রিয়া প্রতিরোধের উপায় ... ৬

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ২ সংখ্যা ৩ কার্তিক ১৪০০

ডায়রিয়াজনিত রোগ চিকিৎসায় জীবাণুনাশক ঔষধ

ডা: এম.এ. সালাম

ডায়রিয়াজনিত রোগ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। এসব রোগে বিশেষ করে শিশুরাই সর্বাধিক আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণ করে থাকে। ডায়রিয়াজনিত রোগে প্রতি বছর উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৪০ লক্ষ শিশু প্রাণ হারায়। বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরই এসব রোগের প্রকোপ দেখা যায়। আক্রান্ত হয় লক্ষ লক্ষ লোক ও মৃত্যুবরণ করে অনেকেই।

এ রোগসমূহের চিকিৎসায় প্রাথমিক অবস্থায় খাবার স্যালাইন সেবন এবং মারাত্মক পানিশূন্যতা হলে শিরায় দেবার স্যালাইন ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। ডায়রিয়া হলে শরীর হতে প্রচুর পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। মুখে খাবার স্যালাইন ডায়রিয়া রোগীর পানি শূন্যতা পূরণ করে। প্রথম হতেই পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার স্যালাইন ব্যবহার করলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের জীবাণু দ্বারা ডায়রিয়া সৃষ্টি হয়। অপরিষ্কার পানি পান, স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃ ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি ডায়রিয়াজনিত রোগ বিস্তারের প্রধান কারণ। এসব রোগ প্রতিরোধ ও উপযুক্ত প্রতিকারের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিশু–মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্ভব। ডায়রিয়াজনিত রোগ চিকিৎসায় পানি ঘাটতি পূরণ, ডায়রিয়া চলা কালে সুষম খাদ্যের সংস্থান ও পরবর্তী সময়ে বাড়তি খাদ্য প্রদান এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ্যান্টিবায়োটিকস বা জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার ফলদায়ক।

ডায়রিয়াজনিত রোগসমূহ সংক্রামক ব্যাধির অন্তর্গত। এসব রোগে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহারের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে মৃত্যু রোধ, রোগের মেয়াদ কমানো, আক্রান্ত রোগী হতে সুস্থ লোকের শরীরে এ রোগ সংক্রমণ রোধ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ডায়রিয়াজনিত রোগ হলেই জীবাণুনাশক ওষুধের ব্যবহার আবশ্যক নয়। এ রোগের চিকিৎসায় তখনি ওষুধের ব্যবহার করা যাবে যখন ওষুধের ব্যবহার ঝুঁকির চেয়ে রোগীর সুবিধা অনেক বেশী এবং যখন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার খরচের চেয়ে ওষুধ ব্যবহারের সুফল বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং সুবিধাজনক হবে। সোজা কথায়, জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহারে যদি ডায়রিয়াজনিত রোগ চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়, তবেই তা ব্যবহারের গুরুত্ব দিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এবছর দেশে যে নুতন ধরনের জীবাণু (ভিবরিও কলেরি নন–ও ওয়ান) (V. cholerae non-01) দ্বারা ডায়রিয়া রোগ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে এ্যান্টিবায়োটিকস বা জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য, রোটাভাইরাস, এ্যান্টারোটক্সিজেনিক ই. কলাই, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার জেজুনি ও

সম্পাদকীয়

সুস্বাস্থ্য সবারই কাম্য। আর এই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি একটি পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ অপরিহার্য। বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরই পানি ও মলবাহিত নানাবিধ রোগ লেগেই থাকে। বিশেষ করে ডায়রিয়াজনিত রোগ যেমন : ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)–এর হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর শুধুমাত্র ডায়রিয়ায় ৩ লক্ষ শিশুর মৃত্যু ঘটে। অথচ ডায়রিয়া একটি সহজ প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধি। এছাড়া শিশুদের কৃমি রোগ অন্যতম একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। শিশুদের কৃমি হলে রক্তশূন্যতা, অপুষ্টি সহ নানাবিধ স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সমস্যা দেখা দেয়। শিশুদের অপর একটি স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে চুলকানি। এখানে শিশুদের প্রধান তিনটি রোগের কথা বলা হ'ল — ডায়রিয়া, কৃমি এবং চুলকানি। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, পয়ঃ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হলে এই তিনটি রোগসহ শিশুদের নানাবিধ অসুখ-বিসুখ হতে রক্ষা করা যায়। এরজন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও স্বল্প আয়ের লোকজনদের ধারণা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পয়ঃ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের নেই। দারিদ্র স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হতো না যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে যার যার সামর্থ্যের মধ্যে কেমন করে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় তার সচেতনতা থাকতো। কাজেই স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যেমন: যার যেমন কাপড়–চোপড় আছে সেগুলো পরিষ্কার রাখা, পাকা পায়খানা না থাকলে মাটিতে গর্ত করে তৈরী পায়খানায় মলত্যাগ, মলত্যাগের পর হাত সাবান অথবা ছাই দিয়ে পরিষ্কার করে ধোওয়া, বাড়ীর আঙ্গিনা ও আশে পাশের ঝোপ–জঙ্গল, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার রাখলে প্রতিরোধযোগ্য অনেক রোগ–ব্যাধি হতে সহজেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

বিশ্বব্যাপী এখন যে শ্লোগানটি বেশ জনপ্রিয় তা হচ্ছে 'প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিউর' অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ করা রোগ নিরাময়ের চাইতে শ্রেয়। এর লাভজনক একটি দিক রয়েছে। আর তা হচ্ছে রোগ প্রতিরোধে শুধু মাত্র স্বাস্থ্য সচেতনা থাকলেই চলে, অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। অথচ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক অর্থের প্রয়োজন পড়ে। শুধুমাত্র নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পয়ঃ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে শতকরা ৮০ ভাগ রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। এর জন্য অবশ্যই সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। যাতে করে প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে উঠে।

সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পয়ঃ ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ পানি পানে সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হলে ডায়রিয়াসহ বহু প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধির প্রকোপ ও মাত্রা হ্রাস পাবে নিঃসন্দেহে।

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্যালমোনেলা নন–টাইফি জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া ওষুধে কার্যকর নয়। এসব জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া সাধারণতঃ এমনিতেই ভাল হয়ে যায়।

ডায়রিয়াজনিত রোগ চিকিৎসায় জীবাণুনাশক ওষুধের ভূমিকা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের ব্যবহার ফলদায়ক বা লাভজনক সে সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। ১ নং ছকে উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য দায়ী প্রধান রোগ জীবাণু এবং এদের শতকরা কত ভাগ মানুষের ডায়রিয়ার জন্য দায়ী তা দেখানো হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শুধুমাত্র সিগেলা, ভিবরিও কলেরি, জিয়ারডিয়া ল্যাম্বলিয়া ও এ্যান্টিমোবিয়া হিস্টোলাইটিকা জীবাণুর সক্রমণে সৃষ্ট ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকে। রোটাভাইরাস, এ্যান্টারোটক্সিজেনিক ই. কলাই, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার জেজুনি, স্যালমোনেলা নন–টাইফি এসব জীবাণুর ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের কার্যকারিতা নেই। তাই এসব জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া সনাক্ত হলে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। প্রধান প্রধান ডায়রিয়াজনিত রোগের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হ'ল।

ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রী বা সিগেলোসিস

ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রী বলতে সিগেলার সংক্রমণে সৃষ্ট আমাশয়কে বুঝায়। এ রোগ অত্যন্ত মারাত্মক। ডায়রিয়াজনিত রোগের মধ্যে এ ধরনের আমাশয়ে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী। এ রোগের জটিলতাও বেশী, যার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া, অপুষ্টি, কিডনীর জটিলতা, রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতা, রক্ত প্রবাহে সংক্রমণ, পেট ফোলা ইত্যাদি। আমাশয়ের সাথে জটিলতা যুক্ত হলে মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ রোগকে সাধারণ মানুষ রক্ত আমাশয় বলে জানে। এ রোগ অতি অল্প সংখ্যক জীবাণু (১০ থেকে ১০০টি) দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে এবং সহজেই রোগীর কাছের সুস্থ লোককে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় উপযুক্ত জীবাণুনাশক ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা হলে রোগীর

ছক–১ ঃ উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের ডায়রিয়ার জন্য দায়ী গুরুত্বপূর্ণ রোগ জীবাণু

জীবাণু	কারণ	শতকরা কত রোগ দায়ী
ভাইরাস	রোটাভাইরাস	১৫–২৫
ব্যাকটেরিয়া	এ্যান্টারোটক্সিজেনিক ই. কলাই	১০–২০
	সিগেলা	৫–১৫
	ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জেজুনি	১০–১৫
	ভিবরিও কলেরি ও–ওয়ান	৫–১০
	স্যালমোনেলা নন–টাইফি	১–৫
	এ্যান্টারোপ্যাথোজেনিক ই. কলাই	১–৫
প্রটোজোয়া	ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম	৫–১৫
রোগ জীবাণু নির্ণয় করা যায় না		২০–৩০

সূত্র ঃ Reading on Diarrhoea. Student Manual (WHO/ CDD/ SOR/90-B)

জটিলতা কমানো ও আরোগ্য লাভ সম্ভব। বাংলাদেশে যে সমস্ত ওষুধ বর্তমানে এ রোগের ক্ষেত্রে কার্যকর তার একটি তালিকা ও ওষুধের মাত্রা ২ নং ছকে দেখানো হয়েছে।

ছক-২ ঃ বাংলাদেশে সিগেলার সংক্রমণে সৃষ্ট রক্ত আমাশয়ের বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য ওষুধ

ওষুধ	ওষুধের মাত্রা ও মেয়াদ	
	প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য	শিশুদের জন্য
১. ন্যালিডিক্সিক এসিড*	১ গ্রাম করে ৬ ঘন্টা পরপর ৫ দিন	প্রতিদিন ৬০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজি ওজনের জন্য। দিনের মাত্রা ৪ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগ ৬ ঘন্টা পরপর ৫ দিন
২. পিভমেসিলিনাম (সিলেক্সিড)	৪০০ মিঃ গ্রাঃ করে ৬ ঘন্টা পরপর ৫ দিন	প্রতিদিন ৫৫-৬০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজি ওজনের জন্য। দিনের মাত্রা ৪ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগ ৬ ঘন্টা পরপর ৫ দিন।
৩. সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৫০০ মিঃ গ্রাঃ করে ১২ ঘন্টা পরপর ৫ দিন	নিরাপদ কিনা এখনও প্রমান সাপেক্ষ

*২ মাসের কম বয়সের শিশুদের বেলায় ব্যবহার করা যাবে না।

কলেরা

ভিবরিও কলেরি ও-ওয়ান নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি হয় কলেরা নামক ঘাতক ব্যাধি। এ রোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতি অল্প সময়ে রোগীর শরীরে মারাত্মক পানি ঘাটতি সৃষ্টি করে, আর পানি ঘাটতিই এ রোগের মৃত্যুর প্রধান কারণ। দীর্ঘ সময় ধরে রোগীর শরীরে পানি ঘাটতি বজায় থাকলে, বিশেষ করে অধিক বয়স্ক রোগীর কিডনীর জটিলতা দেখা দিতে পারে। তবে রোগীকে খাবার স্যালাইন বা অন্তঃশিরা স্যালাইনের মাধ্যমে কিডনীর জটিলতা রোধসহ রোগীর মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। উপযুক্ত ওষুধ দ্বারা চিকিৎসায় এ রোগের মলের পরিমাণ প্রায় ৫০% কমে বলে স্যালাইনের ব্যবহারও অনুরূপভাবে কম লাগে। মনে রাখতে হবে, কলেরা রোগী থেকে অন্যান্যদের সংক্রমণ রোধে জীবাণুনাশক ওষুধের ভূমিকা গৌণ। এ রোগে ব্যবহৃত ওষুধ ও উপযুক্ত মাত্রা ৩ নং ছকে দেখানো হয়েছে।

এ্যামেবিক আমাশয়

গবেষণায় প্রতীয়মাণ হয়েছে যে এ্যামেবিক আমাশয় আমাদের দেশে ১ থেকে ৩ ভাগ ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার জন্য দায়ী। এ ধরনের আমাশয় সাধারণতঃ বয়স্কদের বেশী হয়ে থাকে। শিশুদের এ রোগ কম হয়। তবে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, বিশেষতঃ অপুষ্ট শিশুদের এ রোগ বেশী হয়। এ রোগের ফলে অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং কখনও কখনও জীবাণু অন্ত্র ফুটা করতে এবং যকৃত ফোড়ার সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের আমাশয়ের চিকিৎসায় জীবাণুনাশক ওষুধের প্রয়োজন হয়। অবশ্য ওষুধ দেবার আগে মলের সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা এ রোগ

ছক-৩ ঃ কলেরার চিকিৎসা ব্যবহারযোগ্য ওষুধ

ওষুধ	ওষুধের মাত্রা ও মেয়াদ	
	প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য	শিশুদের জন্য
১. টেট্রাসাইক্লিন*	৫০০ মিঃ গ্রাঃ করে ৬ ঘন্টা পরপর ৩ দিন	প্রতিদিন ৫০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজি ওজনের জন্য। দিনের মাত্রা সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৬ ঘন্টা পরপর ৩ দিন
২. ফুরাজলিডোন**	১০০ মিঃ গ্রাঃ করে ৬ ঘন্টা পরপর ৩ দিন	প্রতিদিন ৫০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজি ওজনের জন্য। দিনের মাত্রা সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৬ ঘন্টা পরপর ৩ দিন।
৩. এরিথ্রোমাইসিন***	৫০০ মিঃ গ্রাঃ করে ৬ ঘন্টা পরপর ৩ দিন	প্রতিদিন ৫০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজি ওজনের জন্য। দিনের মাত্রা সমান ৪ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগ ৬ ঘন্টা পরপর ৩ দিন।
৪. ট্রাইমেথোপ্রিম + সালফামেথোক্সাজল (কো-ট্রাইমক্সাজল)	৮০ মিঃ গ্রাঃ ট্রাইমেথোপ্রিম + ৪০০ মিঃ গ্রাঃ সালফামেথোক্সাজল ১২ ঘন্টা পরপর ৩ দিন	প্রতিদিন ২০ মিঃ গ্রাঃ ট্রাইমেথোপ্রিম+১০০ মিঃ গ্রাঃ সালফা মেথোক্সাজল প্রতি কেজি ওজনের জন্য। দিনের মাত্রা সমান ২ ভাগ করে ১২ ঘন্টা পরপর ৩ দিন।
৫. ডক্সিসাইক্লিন	৩০০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ১ বার	শিশুদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

* বাংলাদেশে ৮ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষেধ।
** শিশুদের ও গর্ভবতী মহিলাদের ব্যবহারের উপযুক্ত, তবে বর্তমানে এ ওষুধ তেমন কার্যকর নয়।
*** শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের ব্যবহারের উপযুক্ত।

সনাক্ত করা প্রয়োজন। কারণ, আমাদের দেশে এ অসুখের চিকিৎসায় কার্যকর ওষুধের মারাত্মক অপব্যবহার হয়। এ রোগে ব্যবহারযোগ্য ওষুধের তালিকা ৪নং ছকে দেখানো হয়েছে।

জিয়ার্ডিয়াসিস

জিয়ার্ডিয়া ল্যাম্বলিয়া নামের পরজীবী দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের জীবাণু ক্ষুদ্রান্তে অবস্থান করে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি করে, যেমন ঃ অরুচি, পেটে ব্যথা, অজীর্ণ, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি। এ রোগের ফলে ওজন কমে যেতে পারে এবং আক্রান্ত রোগী কিছুদিন পরপর ডায়রিয়ায় ভুগতে পারে। রোগ নির্ণয় করার জন্য মলের সাধারণ পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে। তবে ডায়রিয়া চলাকালে মল পরীক্ষা করলে রোগ সনাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অনেক সময় রোগ সনাক্ত করার জন্য পরপর তিন দিন মল

পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। যদি কেহ বার বার ডায়রিয়ায় ভোগে অথবা ঘন ঘন পেটে ব্যথা হয়, অধিক অরুচি হয় বা ওজন কমে যায়, তখন এ ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। এ রোগের ব্যবহার্য ওষুধের তালিকা ৪ নং ছকে দেখানো হয়েছে।

ছক-৪ ঃ এ্যামেবিক আমাশয় ও জিয়ার্ডিয়া দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়ার ব্যবহারযোগ্য ওষুধ

ওষুধ	অসুখ	ওষুধের মাত্রা ও মেয়াদ	
		প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য	শিশুদের জন্য
মেট্রোনি-ডাজল	এ্যামেবিক আমাশয়	৬০০ মিঃ গ্রাঃ করে দিনে ৩ বার = ৭-১০ দিন	৩০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজি ওজনের জন্য। দিনের মাত্রা সমান ৩ ভাগে ভাগ করে দিনে ৩ বার = ৭-১০ দিন
	জিয়ার্ডিয়া দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া	২০০ মিঃ গ্রাঃ করে দিনে ৩ বার = ৫-৭ দিন	১৫ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজি ওজনের জন্য। দিনের মাত্রা সমান ৩ ভাগে ভাগ করে দিনে ৩ বার = ৫-৭ দিন

মনে রাখা দরকার, কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া ডায়রিয়ায় জীবাণুনাশক ওষুধের কোন কার্যকর ভূমিকা নেই। অযথা ওষুধের ব্যবহারের ফলে অর্থের অপচয় ছাড়াও ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রাখা দরকার। আর জীবাণুনাশক ওষুধের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণে ডায়রিয়ার রোগ জীবাণু অতি সহজেই ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করে। ফলে নতুন নতুন এবং দামী ও অধিক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ডায়রিয়ার চিকিৎসায় অযথা ওষুধ ব্যবহার করার আর একটা খারাপ দিক হচ্ছে শরীরের পানিশূন্যতা দূর করার ক্ষেত্রে লোকজন উদাসীন হয়ে উঠতে পারে। আর তাই ডায়রিয়াজনিত রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে রোগ ও ওষুধের ব্যবহারের গুরুত্ব বা লাভ-ক্ষতির মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

কৃমির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

সংলাপ রিপোর্ট

ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রী, জ্বর, কাশি, মাথা ব্যাথা ইত্যাদি অতি সাধারণ রোগ সম্পর্কে আমাদের কমবেশী ধারণা রয়েছে। একজন সাধারণ লোকও এসব রোগের মোটামুটি চিকিৎসা জানেন। যেমনঃ ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইন, ডিসেন্ট্রী বা আমাশয় হলে মেট্রোনিডাজল (ট্রেড নামে এরা জানেন) ইত্যাদি। একইভাবে চোখের সমস্যা হলে বা চোখ ওঠা রোগে যে কেউ নির্দিধায় ওষুধের দোকানিকে বলেন, একটা চোখের ড্রপ বা চোখের মলম দিন। এমনকি অনেকে আবার বলেন, ক্লোরামফেনিকল বা টেরামাইসিন মলম দিন। একইভাবে কেটে গেলে, পুড়ে গেলে বলতে শোনা যায় বারনল, টিটানল অনেক ওষুধের নাম। তেমনি আর একটি অতি সাধারণ রোগ হচ্ছে এ্যাসকারিয়াসিস বা কেঁচো কৃমিজনিত রোগ। কৃমি হচ্ছে অন্ত্রের এক ধরনের ইনফেসটেশন বা রোগ সংক্রমণ। কৃমি নানা ধরনের হতে পারে। যেমনঃ কেঁচো কৃমি, সুতা কৃমি, ফিতা কৃমি, বক্র কৃমি ইত্যাদি। বাংলাদেশ একটি ঘন বসতিপুর্ণ জনবহুল দরিদ্র দেশ। এ দেশের অধিকাংশ লোক অপুষ্টি, নানাবিধ পেটের পীড়া ও রক্তশূন্যতায় (এ্যানিমিয়া) ভোগে। কৃমিজনিত কারণে এসব রোগের উৎপত্তি ঘটে অধিক। অথচ কৃমির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ অত্যন্ত সহজ।

কৃমি হলে বমি-বমি ভাব, পেটে ব্যাথা, চুলকানি এসব উপসর্গ দেখা দেয়। এছাড়া অনেক সময় মুখ ও পায়ুপথে কৃমি বের হয়। অনেক ক্ষেত্রে অন্ত্রের মধ্যে জট পাকিয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে বৃহদান্ত্রের এপেনডিক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ পর্যায়ে অবিকল এপেনডিক্সের প্রদাহের (এপেনডিসাইটিস) মত মনে হয়। এমনকি বহু ক্ষেত্রে সার্জন এপেনডিসাইটিস মনে করে অপারেশনও করেন। শিশুদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা বেশী হয় অথচ এই কৃমি চিকিৎসা ও প্রতিরোধে আমরা মোটেও সচেতন নই। বক্র কৃমি বা হুকওয়ার্ম নামক এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র কৃমির একমাত্র খাদ্য হচ্ছে মানুষের রক্ত। এছাড়া কৃমির আর একটি কাজ হচ্ছে মানুষের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা পুষ্টি উপাদান খেয়ে ফেলা। ভৌগলিক ব্যাপ্তি অনুযায়ী বিশ্বের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ লোক কৃমি রোগে সংক্রমণের শিকার। এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে কৃমি সংক্রমণের হার ৫০ হতে ৭০ ভাগ। মনে রাখতে হবে, কৃমি সংক্রমিত রোগ শিশুদের বেশী হয়। বয়স্কদের শরীরে সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী কার্যকরী। আর একটি কথা বলা দরকার। তা হচ্ছে, ইউনিসেফ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। আর বাকি শতকরা ৯০ ভাগ লোকের ক্ষেত্রে কাঁচা পায়খানা ও অন্যান্য অস্থায়ী অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের অথবা নগরীর বস্তী এলাকায় অধিকাংশ মানুষ

উন্মুক্ত জায়গায় অথবা নদীতে, বিলে, ঝিলে মলত্যাগ করেন। ফলে পানি ও মাটিতে কৃমির ডিম ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এ ধরনের মাটিতে উৎপন্ন কাঁচা শাক-সব্জি সালাদ হিসেবে গ্রহণ করি অথবা দূষিত পানি পান করি। ফলে কৃমির সংক্রমণ ঘটে। এছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামবাসীই খালি পায়ে চলাফেরা করেন। হুকওয়ার্মের জীবাণু মাটি হতে সরাসরি পায়ের নিচের চামড়া দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। এসব কথা জানা থাকলে কৃমিজনিত রোগ প্রতিরোধ করা অনেক সহজ।

এখন আসা যাক কিভাবে কৃমিজনিত সমস্যার সমাধান করা যায়। প্রথমতঃ যারা কৃমির জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়েছেন তাঁদের ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হবে। ওষুধের দোকানে বিভিন্ন ধরনের কৃমি নিধন ওষুধ পাওয়া যায়। এসব ওষুধের মধ্যে মেবেনডাজল ও লেভিমাজল বহুল ব্যবহৃত। এই দু'টি ওষুধের ট্রেডনামে বাজারে অনেক নমুনা পাওয়া যায়। মেবেনডাজল ট্যাবলেট ও সিরাপ হিসেবে পাওয়া যায়। প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে ১টি করে ট্যাবলেট মোট তিনদিন খেতে হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী একই নিয়মে সিরাপ সেবন প্রয়োজন পড়ে। লেভিমাজল বড়দের ক্ষেত্রে একসাথে ৩টি ট্যাবলেট অথবা শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী ওষুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া বাজারে এখন আর একটি কৃমিনাশক ওষুধ পাওয়া যায়। এই ওষুধটির নাম হচ্ছে এ্যালবেণ্ডাজল। আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে সব ধরনের কৃমিনাশক হিসেবে এই ওষুধটি অত্যন্ত কার্যকর। এই ওষুধটির মাত্র ১টি ডোজ সেবন করতে হয়। অবশ্য যে কোন ধরনের ওষুধ সেবনের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। তবে এই রোগ প্রতিরোধ করতে হলে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহার, জীবাণুমুক্ত খাদ্য ও পানি সেবন, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি অপরিহার্য। এছাড়া পায়খানার পর প্রতিবার সাবান এবং প্রচুর পানি দিয়ে হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। সাবান না থাকলে ছাই অথবা মাটি দিয়ে হাত ধোয়া যেতে পারে। গ্রামে-গঞ্জে বা বস্তিতে উন্মুক্ত জায়গায় পায়খানা করা উচিত নয়, কারণ এতে সহজে কৃমিজনিত রোগের বিস্তার হয়। এটা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয় তবে সেক্ষেত্রে পায়ে জুতা বা স্যাণ্ডেল ব্যবহার করা উচিত।

জীবাণু - কিছু কথা

গাজী মোহাম্মদ আলী

আসলে জীবন কি? এর ব্যাখ্যা বিজ্ঞান যা দিয়েছে সেটা নিতান্তই অপ্রতুল। আসলে জীবন যে কি এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান অনেক প্রশ্নের সমাধান এককভাবে এখনও খুঁজে পায়নি। জীবনের ব্যাপকতা এত বেশী যে সমস্ত জীবন নিয়ে আলোচনা করা কঠিন। তাই একটা বিষয়ের উপর সামান্য আলোকপাত করা যাক; আর তা হল জীবাণু (micro-organism)। এরা সাধারণতঃ এক কোষী অনুজীব। যদিও এরা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রাণবন্ত জীবাণু যা খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে রং ছাড়া বা রং করে এগুলোকে দেখা যায়। তবুও দুনিয়াতে এদের বিচরণবিধি, ক্রিয়াকলাপ, বংশবিস্তার, গোত্র, ভালো দিক বা ক্ষতিকারক দিক ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষের জানার চাইতে অজানাই অনেক বেশী। তবুও মানুষ যেটুকুই আয়ত্ত করতে পেরেছে সেটুকু সম্বন্ধে বলতে যাওয়াটাই জ্ঞান ও

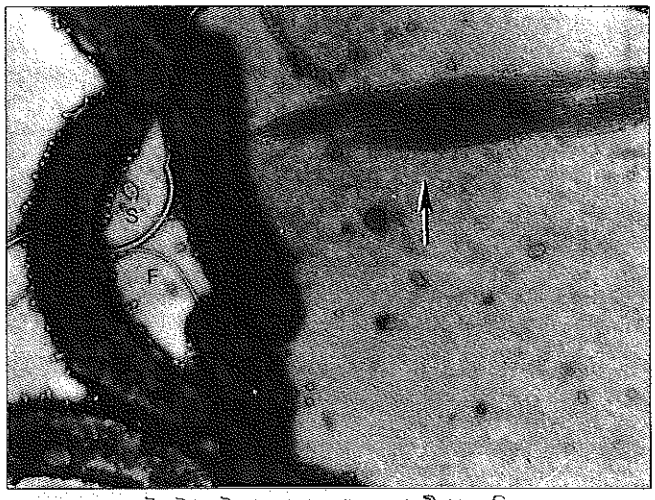

ইলেক্ট্রণ মাইক্রোস্কোপে দেখা কলেরা জীবাণুর ছবি।

সময়ের ব্যাপার। এদের মধ্যে যেগুলো আমাদের উপকারের চাইতে অপকার বেশী করে থাকে, সেগুলো সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা থাকা ভাল।

ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বলেই সবার অজান্তে পানি, স্থল, অন্তরীক্ষে, এক কথায় দুনিয়ার সর্বত্র এদের অবাধ বিচরণ। একমাত্র আগুনের দাহশক্তির কাছেই এরা পরাভূত। এদের বংশবিস্তার অত্যন্ত চমৎকার। একটা জীবাণু থেকে সমানভাবে ভাগ হয়ে ২টা, ২টা থেকে ৪টা, ৪টা থেকে ৮টা, এভাবে ক্রমান্বয়ে এরা বেড়েই চলে। এই বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে জোড়া জোড়া ক্রমবৃদ্ধি (simple binary) বলে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে মাত্র একটা জীবাণু কেবল ১২ ঘণ্টায় ৩ কোটি সাড়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ জীবাণুতে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং পরবর্তী ক্রমবৃদ্ধিগুলো সংখ্যায় প্রকাশ করা সহজ নয়, তার জন্য সাংকেতিক অংকের প্রয়োজন হয়। তবে জীবাণুর এই বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ, যেমন ঃ প্রয়োজনীয় মাধ্যম, খাদ্য, তাপমাত্রা, পিএইচ, অক্সিজেন, আলো, পানীয় ইত্যাদি। উক্ত মাধ্যমে অনেক জীবাণুকে কৃত্রিমভাবে ল্যাবরেটরীতেও চাষ করে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। আকৃতিগত কারণ ছাড়াও নানা কারণে বিজ্ঞানীগণ এদেরকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেন, যেমন ঃ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস, প্রটোজোয়া ইত্যাদি। এদের মধ্যে অনেকগুলোই ক্ষতিকারক (pathogenic) যা রোগ সৃষ্টি করে। আবার অনেকগুলো চামড়ার উপর, নাকে, কানে থাকে বা শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করে, কিন্তু কোন ক্ষতি করে না। এদেরকে কমেনসেল নামে অভিহিত করা হয়। কোন কোন সময় অবস্থা ও অবস্থান ভেদে এসব জীবাণু আবার ক্ষতিও করে থাকে। যদি এগুলো খাদ্য বা উচ্ছিষ্ট খাদ্যে, মাটিতে, পানিতে বা অন্ত্রে বসবাস করে বা সহ অবস্থান করে তখন তাদেরকে সেপ্রোফাইট বলে।

রোগী থেকে সুস্থ মানুষের মধ্যে কিছু রোগের জীবাণু হাঁচি, কাশি, মলমূত্র ও বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। এগুলোকে ছোঁয়াচে রোগ বলে। যেমন সর্দি, জ্বর, হাম, হুপিং কাশি, জল বসন্ত, ডিপথেরিয়া, যক্ষা ইত্যাদি। প্রতিবার হাঁচি কাশির সঙ্গে কয়েক কোটি জীবাণু বের হতে পারে। রোগীর ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদেও অগণিত জীবাণু থাকে, তাই এগুলো যথাযথভাবে পরিষ্কার করা উচিত। কোন কোন প্রাণী বা জীবজন্তু থেকেও মানুষের মধ্যে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে, যেমন ঃ প্লেগ, ব্রুসেলোসিস, জলাতংক (rabies) ভাইরাস ইত্যাদি।

এমন অনেক জীবাণু আছে যাদের প্রাণীকুলের অন্ত্রের মধ্যেও বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে মানুষের অন্ত্রেই এদের বসবাস। মানুষ দৈনন্দিন যে মল ত্যাগ করে তা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে এর মধ্যে এক গ্রাম মল বা মটরশুঁটি পরিমাণ মলের মধ্যে প্রায় একশত কোটি বিভিন্ন বংশের বা বিভিন্ন গোত্রের জীবাণুর অস্তিত্ব থাকে। এদের মধ্যে অনেকগুলো মানুষের পরিপাক যন্ত্রের জন্য সহায়ক। কিন্তু কিছু জীবাণু মানব দেহের ক্ষতি করে থাকে, যেমন ঃ কলেরার জীবাণু (ভিবরিও কলেরী) যা কলেরার জন্য দায়ী, শিগেলা জীবাণু যা রক্ত আমাশয়ের জন্য দায়ী, টাইফি বা প্যারাটাইফি যা টাইফয়েড জ্বরের জন্য এবং পেটের পীড়ার জন্য দায়ী ইত্যাদি। এ জাতীয় জীবাণুগুলো মাছি, পানি, পচা বাসি খাবার, কাঁচা ফলমূল ইত্যাদি খাবারের মাধ্যমে মুখ দিয়ে মানবদেহের পেটের মধ্যে গিয়ে বংশ বৃদ্ধি করে এবং নানা রোগের সৃষ্টি করে। তাছাড়া প্যারাসাইট বা পরজীবীর দ্বারা পেটের পীড়া দেখা দেয়, যেমন ঃ এ্যামিবা, জিয়ারডিয়া, কৃমি ইত্যাদি।

মানব দেহের অন্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে অবস্থান করে এমন আরও অনেক জীবাণু আছে, যেমন ঃ ফুসফুসে ষ্টেফাইলোকক্কাই, ষ্ট্রেপটোকক্কাস নিমোনি বা নিউমোনিয়ার জীবাণু, ক্লেবশিয়েলা, টিউবারকুল ব্যাসিলাস ইত্যাদি। তাছাড়া ভাইরাস (আরও ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র) নামক জীবাণু শ্বাসনালীতে প্রদাহের সৃষ্টি করে থাকে। মূত্রাশয় বা মূত্রথলি ও কিডনী অনেক সময় বিভিন্ন জীবাণুর মাধ্যমে আক্রান্ত হতে পারে, যেমন ঃ ই. কলাই, ক্লেবশিয়েলা, প্রোটিয়াস, সালমোনেলা, ষ্টেফাইলোকক্কাই, ষ্ট্রেপটোকক্কাই ইত্যাদি। এরা কিডনীর (মূত্র ছাকনী) মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এমনকি কিডনী অকেজো করে দিতে পারে। গলায়ও জীবাণু আক্রান্ত হয়ে রোগের সৃষ্টি হয়। যেমনঃ বিশেষ ধরনের ষ্ট্রেপটোকক্কাই, ষ্টেফাইলোকক্কাই, নিমোকক্কাই, টাইফি, প্যারাটাইফি জীবাণু সনাক্ত করা হয়। পুঁজ পরীক্ষা করে ষ্টেফাইলোকক্কাই, ষ্ট্রেপটোকক্কাই, প্রোটিয়াস, ই. কলাই, সিডোমোনাস এবং ক্লেবশিয়েলা পাওয়া যায়। চোখের নিসৃত রস পরীক্ষা করে ষ্টেফাইলোকক্কাই, ষ্ট্রেপটোকক্কাই, প্রোটিয়াস, ই. কলাই, ক্লেবশিয়েলা, হিমোফিলাস সনাক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত জীবাণুগুলোর সংক্রমণের কারণে এবং তাদের অবস্থান ভেদে কোন না কোন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। জীবাণুগুলোকে ল্যাবরেটরীতে সনাক্ত করার মাধ্যমে ওষুধ দিয়ে পরীক্ষা করে রোগীকে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করে রোগ নির্মূল করা যায়।

হলদে রোগ বা জণ্ডিসের জন্য যে জীবাণু (ভাইরাস) দায়ী তা হচ্ছে হেপাটাইটিস এ.বি.সি.ডি.ই. ইত্যাদি। রক্ত পরীক্ষা করে এসব ভাইরাস সনাক্ত করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী যে প্রলয়ংকরী রোগ ব্যাপক আকারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, যা মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়, সেই এইডস রোগের জীবাণু (এইচ.আই.ভি) তাও রক্তের মধ্য থেকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। অদ্যাবধি এ রোগ প্রতিকারের ব্যাপারে বিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করতে পারেনি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীগণ এইডস রোগের প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন।

ডায়রিয়া প্রতিরোধের উপায়

* সব সময় টিউবওয়েলের পানি পান করুন। টিউবওয়েলের পানি না পাওয়া গেলে বিশোধিত পানি ব্যবহার করুন।
* হাঁড়ি পাতিল, খাবার বাসন-পত্রগুলো টিউবওয়েলের অথবা বিশোধিত পানি দিয়ে ধুবেন।

ফাইল

* দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খাবেন না। বাসী খাবার খেতে হলে অবশ্যই ভাল করে গরম করে খাবেন।
* সব ধরনের খাবার ও পানি ঢেকে রাখুন।

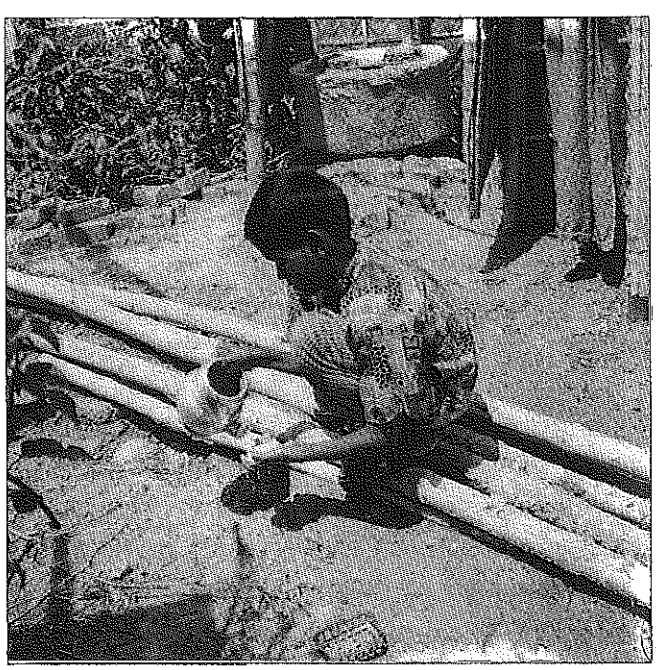

ফাইল

* নিজে খাবার আগে, বাচ্চাকে খাওয়ানোর আগে, পায়খানার পর এবং বাচ্চাকে শোচানোর পর অবশ্যই হাত ধুবেন। সাবান বা ছাই অথবা মাটি দিয়ে দু'হাত কচলিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধুবেন।
* পুকুর, নদী ও টিউবওয়েলের আশে-পাশে পায়খানা করবেন না এবং বাচ্চাদেরও পায়খানা করতে দেবেন না। বাচ্চাদের পায়খানা বড়দের পায়খানার মতই ক্ষতিকর।
* ডায়রিয়া রোগীর পায়খানা গর্ত করে পুঁতে ফেলুন।
* বাচ্চাকে প্রথম ৪ মাস বয়স পর্যন্ত কেবলমাত্র মায়ের দুধ খাওয়াবেন।

স্বাস্থ্য কুইজ-৬

১. যে সকল মায়েরা বাচ্চাকে বুকের দুধ দেন তাদের জন্য কোন চারটি জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল?
২. প্রসবোত্তর পরীক্ষার সময় অন্তত: কোন চারটি বিষয় মাকে প্রশ্ন করা উচিত?
৩. পুন:ব্যবহারযোগ্য সূচ এবং সিরিঞ্জ ভালভাবে নির্বীজন বা জীবাণুমুক্ত (sterilize) না করা হলে কি কি মারাত্মক রোগ ছড়াতে পারে?
৪. একটি ১০ মাসের বাচ্চার মিনিটে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের হার কত?
৫. গর্ভাবস্থায় কোন সময় টিটেনাস টক্সয়েড টিকা নেয়া উচিত?

(উত্তর আমাদের কাছে ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখের আগেই পৌছাতে হবে।)

স্বাস্থ্য কুইজ-৫-এর উত্তর

১. মাত্র ১০ থেকে ১০০টি জীবাণু রক্ত আমাশা ডেকে আনতে পারে।

২. ডায়রিয়া, নিম্ন শ্বাসনালীর অসুস্থতা (যেমন: নিউমোনিয়া), রাতকানা।

৩. মাসিক চলাকালে বা মাসিকের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে আই.ইউ.ডি. পরা সবচেয়ে নিরাপদ।

৪. হ্যাঁ, পারে। রান্নার সাথে একটু বাড়তি তেল মিশিয়ে নিয়ে খাবারের পুষ্টিমান বাড়ানো যায়।

৫. ১৮১৭ সালে যশোর জেলায় বিশ্বে সর্বপ্রথম কলেরার মহামারী শুরু হয়।

স্বাস্থ্য কুইজ-৫-এর সঠিক উত্তরদাত্রীর নাম :

নিপা চৌধুরী
প্রযত্নে রফিকুল আলম চৌধুরী
ভিএইড রোড
মুন্সীপাড়া, গাইবান্ধা।

জেনে রাখা ভাল

ডুবে গেলে ঃ

পানিতে ডুবে গেলে মানুষ সাধারণতঃ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। কারণ সে যখন বাঁচার চেষ্টা করে, তখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পানি তার শ্বাসনালীতে ঢুকে যায়। পানি কিন্তু তার মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়। আসলে, জিহ্বার পিছনে শ্বাসনালীর শুরুতে একটা ঢাকনার মত আছে (epiglottis), এই ঢাকনাটি পানি ঢোকার ফলে সংকুচিত (spasm) হয়ে শ্বাসনালীতে বাতাস প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয়। যার ফলে পানিতে ডুবে যাওয়া মানুষ অনেক সময় মারা যায়। তবে খুব দ্রুত চেষ্টা করলে তাকে হয়তো বাঁচানো সম্ভব।

আপনি যদি ভাল সাঁতারু না হন, নিমজ্জমান মানুষকে বাঁচাবার জন্য কখনও সরাসরি পানিতে ঝাঁপ দেবেন না। তাকে উদ্ধার করার জন্য আপনি কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে পারেন :

১. সে যদি পাড়ের কাছাকাছি থাকে, তবে তাকে লম্বা শক্ত লাঠি বা দড়ি এগিয়ে দিন। দড়ি পাওয়া না গেলে শাড়ী অথবা লম্বা মজবুত কাপড় এগিয়ে দিতে পারেন। আপনি নিজে যদি উদ্ধারকারী হন, তবে পাড়ের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। চেষ্টা করুন আপনার পায়ের গোড়ালী কোন গাছ বা খুঁটির সাথে আটকে রাখতে। অথবা অন্য কাউকে বলুন আপনাকে শক্ত করে ধরে রাখতে। এবার লাঠি, দড়ি বা শাড়ীর এক প্রান্ত আপনি ধরুন এবং আর এক প্রান্ত নিমজ্জমান ব্যক্তিকে শক্ত করে ধরতে বলুন। ধীরে ধীরে তাকে পাড়ের কাছে টেনে আনুন।

২. সে যদি পাড় থেকে বেশ দুরে থাকে তবে তার দিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু ছুঁড়ে দিন। যেমনঃ খেলার বল বা রিং, কলা গাছ বা নিদেন পক্ষে একটি কলস। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করা সম্ভব না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এসবের সাহায্যে সে ভেসে থাকার চেষ্টা করতে পারবে।

৩. চেষ্টা করুন একটা নৌকা জোগাড় করতে। নৌকা চালিয়ে নিমজ্জমান লোকটার ধারে কাছে যান। কিন্তু খুব কাছে যাওয়া যাবে না। কাছে গেলে ক্লান্ত, ডুবন্ত ব্যক্তি নৌকার তলায় চলে যেতে পারে, ঢেউয়ের ধাক্কায় দুরে চলে যেতে পারে অথবা হঠাৎ আঘাত পেতে পারে।

৪. কোন কিছুই না পেলে এবং আপনি ভালো সাঁতারু হলে পানিতে নামতে পারেন। সাঁতার কেটে কাছাকাছি যান। কিন্তু তাকে ধরবেন না। ধরলে দু'জনই একসাথে ডুবে যেতে পারেন। কারণ ডুবন্ত ব্যক্তি আপনাকে জড়িয়ে ধরবে। তাকে কাপড় বা দড়ি এগিয়ে দিয়ে শক্ত করে ধরতে বলুন, আর অন্য প্রান্ত আপনি শক্ত করে ধরুন। এবার সেই দড়ি বা কাপড়ের সাহায্যে তাকে টেনে এবং নিজে সাঁতার কেটে তাকে পাড়ে নিয়ে আসুন। তাকে সাহস দেয়ার জন্য সান্তনা দিন এবং কথা বলতে থাকুন।

যদি ডুবন্ত ব্যক্তিকে আপনার ধরতেই হয়, তবে তার মাথার দিকে যান। ডুবন্ত ব্যক্তিকে পানির উপর চিৎ হয়ে ভেসে থাকতে চেষ্টা করতে বলুন। এবার এক হাত দিয়ে তার থুতনীর নিচে ধরে টেনে আনতে থাকুন, আর এক হাত দিয়ে সাঁতার কাটুন।

উদ্ধার করার পর ঃ

১. তার যদি শ্বাস বন্ধ হয়ে যেয়ে থাকে, কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন (বেশাখ সংখ্যায় বর্ণিত পদ্ধতিতে মুখে মুখ রেখে) এবং দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

২. ডুবন্ত মানুষ অনেক সময় পানি গিলে থাকে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস দিলে খাবারসহ যাতে পানি বেরিয়ে আসে এজন্য তাকে কাত করে শুইয়ে দিন এবং বার বার মুখ পরিস্কার করুন।

৩. সে নিজে শ্বাস নিতে আরম্ভ করলে তাকে উল্টো করে শুইয়ে দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব না হয় ততক্ষণ তাকে শোওয়ানো অবস্থায় একদিকে ঘাড় কাত করে রাখুন।

গলায় কিছু আটকে গেলেঃ

খাবার বা খুলে যাওয়া নকল দাঁত অথবা শিশুদের ক্ষেত্রে খাবারের অংশ, বাদাম, ছোট খেলনা বা খেলার জিনিস গলায় আটকে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে আক্রান্ত মানুষ বা শিশু অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, এমনকি তাদের মৃত্যুও হতে পারে।

গলায় কিছু আটকে গেলে আক্রান্ত ব্যক্তি বা শিশু প্রথমে প্রচণ্ড কাশতে শুরু করে, তার মুখের রং নীল হয়ে যায় এবং গলার ও মাথার শিরা ফুলে যায়।

১. প্রথমে আটকে যাওয়া বস্তুটা বের করে ফেলার চেষ্টা করুন। তাকে কাশি দেয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

২. এই প্রক্রিয়া যদি কার্যকরী না হয়, তবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মাথা নিচু করতে বলুন। লক্ষ্য রাখবেন, যাতে তার মাথা বুকের চেয়ে নিচু থাকে। এবার হাতের তালু দিয়ে তার পিঠের হাড় (Scapula) দু'টির মাঝখানে জোরে জোরে চাপড় দিন। এই চাপড়গুলো এমনভাবে দিতে হবে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি কাশি দেয়।

পিঠের হাড় দু'টির মাঝখানে জোরে জোরে চাপড় দিন।

সে যখন শ্বাস নিতে শুরু করবে তাকে বসতে দিন এবং শান্ত হতে সাহায্য করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে খানিকক্ষণ পরপর অল্প পরিমাণে পানি পান করতে দিন।

৩. উপরে বর্ণিত দু'টো পদ্ধতি ব্যর্থ হলে পেটের উপর চাপ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। এই চাপ দেয়ার পদ্ধতিটি বিপজ্জনক। এর ফলে যকৃতের বা পেটের ভিতরের অন্যান্য অংগের ক্ষতি হতে পারে । কিন্তু জীবন রক্ষার জন্য এই পদ্ধতি জেনে রাখা ভাল। প্রথমে আপনি আক্রান্ত ব্যক্তির পেছনে দাঁড়ান। এক হাত মুঠি করুন। বুড়ো আংগুল আপনার মুঠির ভিতরে থাকবে। পেছন দিক থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ধরুন এবং হাতের মুঠিটা বুকের হাড় ও নাভীর মধ্যখানে পেটের উপর রাখুন।

আপনার আর এক হাত দিয়ে মুঠ করা হাতটা ধরুন। এবার পেটের ভিতরের ও উপরের দিকে জোরে জোরে চার বার ধাক্কা দিন। এভাবে ধাক্কা দিয়ে আপনি প্রকৃতপক্ষে উপরের পেট ঠেলে ফুসফুসের তলার দিকে লাগানোর চেষ্টা করছেন। এর ফলে ভিতরের বাতাসের চাপে আটকে যাওয়া বস্তু বেরিয়ে আসতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে, তার মাথা নিচের দিকে দিয়ে উল্টো করে হাতের উপর ধরুন। আপনি চেয়ার বা টুলের ওপর বসে পায়ের উপরও শিশুটিকে শুইয়ে দিতে পারেন। সে যাতে পড়ে না যায় এজন্য শিশুর বুকের তলা দিয়ে হাত দিয়ে তার থুতনী ধরে রাখুন। এবার বড়দের মতই পিঠে দুই হাড়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম জোরে চাপড় দিন। আটকে যাওয়া বস্তুটি বেরিয়ে এলে অত্যন্ত সাবধানে সরিয়ে নিন। তাকে শান্ত হতে সাহায্য করুন।

(সংগ্রহ ঃ ডা: সেলিনা আমিন)

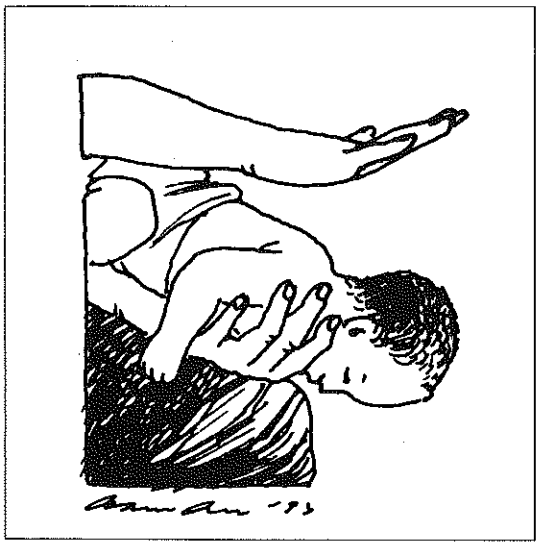

শিশুদের এভাবে আস্তে আস্তে চাপড় দিন।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ এম. নজরল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, ডাঃ এ.এস.এম. মিজানুর রহমান, মুজিবুর রহমান ও ডাঃ তানজিনা মির্জা; **সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ** হাসান শরীফ আহমেদ; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী। **প্রকাশক ঃ** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর.,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০।

ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬, টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আই.সি.ডি.ডি. বি.জে।

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ